রাজনীতির তৃতীয় ধারা

গোলাম মোর্তোজা ও অনিরুদ্ধ ইসলাম

অনেক শ্রম আর ত্যাগের বিনিময়ে তৈরি হলো একটি বিশাল জাহাজ। ভাসলো সাগরে। মাঝ সাগরে গিয়ে আবিষ্কার হলো তলায় ফুটো। ক্যাপ্টেন অনবরত 'এসওএস' বার্তা পাঠাচ্ছেন। কোনো সাড়া মিলছে না। উদ্ধারের জন্য কেউ এগিয়ে আসছে না। ক্রমেই ডুবে যাচ্ছে জাহাজ। ক্যাপ্টেন আশা করে আছেন, ঈশ্বর নিশ্চয় সাড়া দেবেন তার প্রার্থনায়। কোনো মহামানব বা দেবদূত আবির্ভূত হবেন, উদ্ধার করবেন নিমজ্জিত জাহাজকে।

গল্পটির অবতারণা এই কারণে যে, এর সঙ্গে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন এই রাষ্ট্রটির বেশ মিল আছে। এই বিশাল জাহাজটি হচ্ছে বাংলাদেশ। আর ক্যাপ্টেন হচ্ছেন বাংলাদেশের জনগণ। উদ্ধারের আশায় যাদের কাছে 'এসওএস' পাঠানো হচ্ছে তাদের নাম রাজনীতিবিদ। ক্রমশ নিমজ্জিত জাতি উদ্ধার পেতে পারে এমন কোনো কিছুই রাজনীতিবিদরা করছেন না। উল্টো তাদের কর্মকান্ডে জাহাজ আরো দ্রুত গতিতে নিমজ্জিত হচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষ আশায় আছে সেই মহামানবের- যিনি আসবেন, উদ্ধার করবেন। নতুন স্বপ্নে উজ্জীবিত করবেন জাতিকে।

বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের রাজনীতিবিদদের পালাক্রম শাসনে মানুষের জীবন অতিষ্ঠ। এই শাসন মানুষ চায় না। না চাইলেও তাদের উপায় নেই। উপায়হীনতার মাঝে মানুষ ভাবে

তৃতীয় শক্তির কথা। আবার এই তৃতীয় শক্তি নিয়েও মানুষ নিশ্চিন্তে থাকতে পারে না। রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতায় 'প্রিয় দেশবাসী' বলে অতীতে সব সময় জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের দায়িত্ব ক্যান্টনমেন্টওয়ালারা নিয়েছে। নিয়ে নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন করেছে। তৃতীয় শক্তি হিসেবে তারা নিজেদের প্রায় প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছিল। বাস্তবতার কারণে এখন আর ক্যান্টনমেন্ট থেকে এসে 'প্রিয় দেশবাসী' বলে ক্ষমতা নেয়ার পরিবেশ সম্ভবত নেই। এ কারণে এখন তৃতীয় শক্তি বলতে অগণতান্ত্রিক শক্তিকে বোঝানো হচ্ছে না। গণতান্ত্রিক শক্তিই আসছে 'তৃতীয়' বা 'নতুন' শক্তির আলোচনায়। সাবেক বিএনপি নেতা বি. চৌধুরী এবং সাবেক আওয়ামী লীগ নেতা ড. কামাল হোসেন উঠে এসেছেন এই আলোচনায়। বলা যায় তারা নিজেরাই জন্ম দিয়েছেন এই আলোচনার।

বাংলাদেশের রাজনীতি রমজানে সাধারণত এক ধরনের অলস সময় কাটালেও এবার হঠাৎ করেই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। সরকারি ও প্রধান বিরোধীদলের আলোচনাতেও 'তৃতীয় শক্তি'র প্রসঙ্গ উঠেছে। দেশের প্রধান রাজনৈতিক নেতারা এ নিয়ে বিক্ষোভ চিত্তচাঞ্চল্য না দেখালেও তারাও যে এ ধরনের সম্ভাবনায় কিছুটা উদ্বিগ্ন সেটা বেশ বোঝা যায়। এই তৃতীয় শক্তি

নিয়ে যখন আলোচনা ওঠে তখন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ওমরাহ করতে দেশের বাইরে ছিলেন। তিনি দেশে ফিরে এ বিষয়ে মুখ খোলেননি। দলের বিভিন্ন নেতা 'তৃতীয় শক্তি'র আবির্ভাবকে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করেছেন। বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভুঁইয়া এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল এই তৃতীয় বা নতুন শক্তি বিষয়ে প্রায় অভিন্ন কথা বলেছেন। কেউই বিষয়টিকে ভালোভাবে নেননি। মান্নান ভুঁইয়া বলেছেন, সরকারের পতন হলেও তৃতীয় শক্তি ক্ষমতায় আসতে পারবে না। এমন কথা মান্নান ভুঁইয়া কেন বলছেন? তার মানে কী তৃতীয় শক্তিকে মান্নান ভুঁইয়া তাদের জন্যে হুমকি মনে করছেন? তবে প্রধানমন্ত্রী একেবারেই বিচলিত হননি সেটা বলা যাবে না। জানা গেছে, তিনি ইতিমধ্যে এই তৃতীয় শক্তি নিয়ে তার কেবিনেটের সিনিয়র মন্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ করেছেন। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সেভাবে কোনো মন্তব্য করা না হলেও পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা তার দলের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে বলেছেন, 'তৃতীয়

> বি. চৌধুরী বা ড. কামাল হোসেনের যে রাজনৈতিক পরিচিতি তাতে তাদের তৃতীয় শক্তি বা নতুন ধারার কোনো রাজনৈতিক শক্তির নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা আছে কিনা সেটা নিয়ে বড় প্রশ্ন রয়েছে

শক্তি' নিয়ে যে জল্পনা-কল্পনা চলছে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। তারাই প্রধান শক্তি। অবশ্য দলের নেতারা কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে এ নিয়ে তাদের উদ্বেগ গোপন করেননি।

স্বাভাবিকভাবে ধারণা করা হয়, আওয়ামী লীগ মনে করে বিএনপি সরকার ব্যর্থ হলে আগামী নির্বাচনে মানুষ আওয়ামী লীগকেই ভোট দেবে। এর মানে তৃতীয় শক্তির নাক গলানোটা আওয়ামী লীগও ভালো চোখে দেখছে না। কথা দিয়ে যদি সরকার পতন সম্ভব হতো তাহলে শেখ হাসিনা ইতিমধ্যেই সফল হয়ে যেতেন। কারণ তিনি প্রতিদিন সরকার পতন বিষয়ে এত কথা বলছেন, তার সামান্য পরিমাণও যদি ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন করতে পারতেন তাহলে বর্তমান সরকার বেশ বিপদে পড়তো, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। সরকারের জন্য বিব্রতকর এবং বিপজ্জনক বেশকিছু ইস্যু ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে আছে। উত্তরাঞ্চলে মঙ্গা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, অবনতিশীল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সর্বত্র দুর্নীতি, সমন্বয়হীন, অকার্যকর বিশাল মন্ত্রিপরিষদ ইত্যাদি ইস্যুতে আওয়ামী লীগ চোখে পড়ার মতো কোনো আন্দোলন করতে পারেনি। আন্দোলন মানেই 'হরতাল' আর 'গলাবাজি' কালচারেই অভ্যস্ত হয়ে আছে। দেশের মানুষ বর্তমান সরকারের কর্মকান্ডে চরম অখুশি- এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাবে মানুষ সেটাও বিশ্বাস করতে পারছে না। বিশ্বাস করার কোনো যৌক্তিক কারণও নেই। কারণ আওয়ামী লীগ অতীতে ক্ষমতায় এসে, আজকে বিএনপি বা জোট সরকার যা করছে তার ব্যতিক্রম কিছু করেনি।

পরিস্থিতি আওয়ামী লীগের অনুকূলে না হলেও, ধরেই নিয়েছে আগামী নির্বাচনে তারা ক্ষমতায় আসছে। যেন ক্ষমতায় আসাটা শুধুই সময়ের ব্যাপার। ভোটের যে সমীকরণ সেই সমীকরণে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে তৃতীয় শক্তির পক্ষে সম্ভব নয় ক্ষমতায় আসা। কিন্তু আওয়ামী লীগের পক্ষে কী সম্ভব? ভোটের সমীকরণ কী বলে?

আগামী নির্বাচনে বিএনপি তথা চারদলীয় জোটের আসন সংখ্যা কমবে। আওয়ামী লীগের আসন সংখ্যা বাড়বে। চারদলীয় জোটে ভাঙন ধরবে না এবং গত তিনটি নির্বাচন যেমন নিরপেক্ষ হয়েছে আগামী নির্বাচনও তেমন নিরপেক্ষ হবে- এই সম্ভাবনা ধরে নিয়েই এই মন্তব্য। আওয়ামী লীগ যত চেষ্টাই করুক, চারদলীয় জোটে ভাঙন ধরাতে পারবে না। কারণ চারদলীয় জোটের অন্য তিনটি দল যদি বিএনপিকে বাদ দিয়ে বেরিয়ে যায় তাহলে তাদের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। এ কথা তারা খুব ভালো করেই জানে। তাই জোটের ভেতরে নানা সমস্যা দেখা দেবে, আমিনীরা হুমকি দেবে কিন্তু জোট ছেড়ে বেরিয়ে যাবে না। জামায়তের তো বের হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই-ই। তারপরও সরকার পরিচালনায় ব্যর্থতার জন্য চারদলীয় জোটের আসন সংখ্যা কমবে। বিরোধী দলে থাকার সুবিধার জন্য আওয়ামী লীগের আসন বাড়বে। প্রশ্ন হলো, কত বাড়বে? এখন আছে ষাটটি আসন। হয়তো দ্বিগুণ অর্থাৎ একশ' বিশটি হবে। অথবা একশ' ত্রিশ বা চল্লিশ হবে। কিন্তু সরকার গঠন করতে হলে তো কমপক্ষে একশ' পঞ্চাশটি আসন পেতে হবে। এই পরিমাণ আসন কী আওয়ামী লীগের পক্ষে পাওয়া সম্ভব? ভোটের সমীকরণ সে কথা বলে না। এমনটা ঘটা তখনই সম্ভব, আওয়ামী লীগ যদি জাতীয় পার্টি (এরশাদ), জাতীয় পার্টি (মঞ্জু), বামদল, তৃতীয় শক্তি হিসেবে আলোচিত নেতা ড. কামাল হোসেন প্রমুখদের সঙ্গে জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন করে। এই সবগুলো দলকে একত্রে নিয়ে নির্বাচন করতে হলে আওয়ামী লীগকে অনেক কিছু ছাড় দিতে হবে। কিন্তু আওয়ামী লীগের যে রাজনৈতিক চরিত্র তাতে 'ছাড়' দেয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। তারপর আবার এরশাদের ওপর সামান্যতমও আস্থা রাখা যায় না।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা একেবারে উঠে না গেলেও দেড় দশক সেনা শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতা, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান, পরবর্তীতে রাজনীতিতে পরিবর্তন এবং সর্বোপরি বিশ্ব পরিস্থিতিতে পরিবর্তনের কারণে সেনাবাহিনীর পক্ষে এখন আর সেভাবে চট করে এবং প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতা গ্রহণ সম্ভব নয়। সে কারণে 'তৃতীয় শক্তি'র ক্ষেত্রে সিভিল সোসাইটির কথা এসেছে। অবশ্য বাংলাদেশে এই সিভিল সোসাইটিটা কি বা কারা এর অন্তর্ভুক্ত সেটা বিশেষ স্পষ্ট নয়। সিভিল সোসাইটি বলতে যারা পরিচিত তাদের প্রায় কারোরই নিজস্ব কোনো মতাদর্শ নেই। তারা সবাই আওয়ামী লীগ বা বিএনপি'র রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী। দলীয় রাজনৈতিক কর্মীর সঙ্গে তাদের খুব বেশি পার্থক্য নেই। এ কারণে সমাজে বা সাধারণ মানুষের কাছে তাদের তেমন একটা গ্রহণযোগ্যতা নেই। এরা সমাজবিচ্ছিন্ন এবং

কামাল হোসেন বা বি. চৌধুরী মহামানব হিসেবে আবির্ভূত হয়ে দেশের রাজনীতিতে মৌলিক কোনো পরিবর্তন সাধন করবেন- এমনটা ভাবার সম্ভবত অবকাশ নেই। তবে বি. চৌধুরী আলাদা রাজনৈতিক দল গঠন করলে সাময়িকভাবে বিএনপির কিছুটা বিপদে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সুবিধাবাদী শ্রেণী হিসেবে পরিচিত। রাজনৈতিক দলের বাইরে বিভিন্ন পেশাজীবী এবং এনজিওদের এই সিভিল সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হচ্ছে। তবে এ নিয়েও বিতর্ক আছে। তাছাড়া বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন অতীতে এরশাদ আমলে এরশাদ পতনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে এক থাকলেও, এরশাদ পরবর্তী আমলে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি এই দু'দলের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে আছে। সুতরাং সেভাবে কোনো একক পেশাজীবী সংগঠন বা সংস্থা পাওয়া যাবে না। সম্প্রতি বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধি, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক-বেসামরিক আমলা, গবেষক, বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের সিভিল সোসাইটির অংশ বলে দাবি করছেন। সিভিল সোসাইটিকে নিয়ে দেশ পরিচালনার যে ফর্মুলার কথা শোনা যায় তাকেই অনেকে এই 'তৃতীয় শক্তি' বলে আখ্যায়িত করছে।

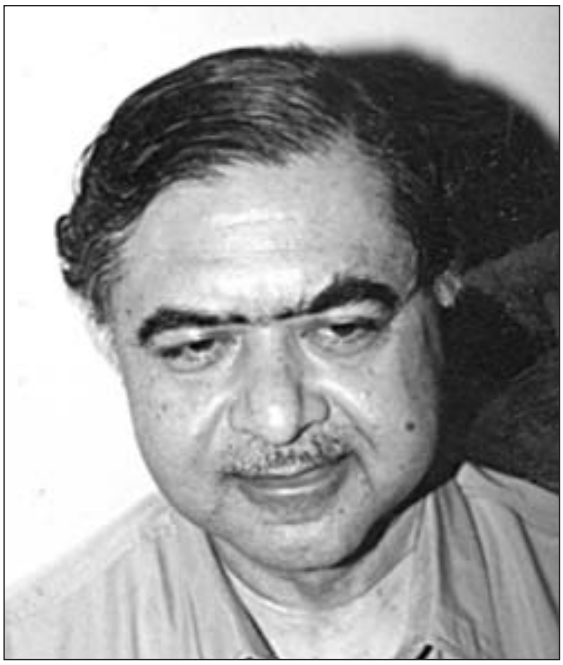

> বিরোধী দলে থাকার সুবিধার জন্য আওয়ামী লীগের আসন বাড়বে। প্রশ্ন হলো, কত বাড়বে? এখন আছে ষাটটি আসন। হয়তো দ্বিগুণ অর্থাৎ একশ' বিশটি হবে। অথবা একশ' ত্রিশ বা চল্লিশ হবে। কিন্তু সরকার গঠন করতে হলে তো কমপক্ষে একশ' পঞ্চাশটি আসন পেতে হবে। এই সবগুলো দলকে একত্রে নিয়ে নির্বাচন করতে হলে আওয়ামী লীগকে অনেক কিছু ছাড় দিতে হবে। কিন্তু আওয়ামী লীগের যে রাজনৈতিক চরিত্র তাতে 'ছাড়' দেয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। তারপর আবার এরশাদের ওপর সামান্যতমও আস্থা রাখা যায় না

বিএনপি কর্তৃক রাষ্ট্রপতি পদ থেকে বিতাড়িত হবার পর ডা. বি. চৌধুরী এতদিন রাজনীতিতে সম্পূর্ণ নিশ্চুপ ও নিষ্ক্রিয় ছিলেন। এমনকি রাষ্ট্রপতি পদ থেকে তার অসম্মানজনক বিদায় নিয়েও তিনি কোনো কথা বলতে রাজি হননি। কথা বলেননি। কিন্তু গত রমজানে হঠাৎ করে একটি ট্যাবলয়েড পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিয়ে তিনি বর্তমান সরকার সম্পর্কে যেসব কথা বলেন, সেটা রাজনীতির অঙ্গনে বিশেষ ঢেউ তোলে। পরবর্তীতে তিনি বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন পেশার মানুষ, সাংবাদিক ও কূটনীতিকদের জন্য যে ইফতার পার্টির আয়োজন করেন সেই ইফতার পার্টিতে ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বর্তমান দুঃসহ অবস্থায় 'সিভিল সোসাইটি'কে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান এই 'তৃতীয় শক্তি' সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনাকে আরও তুঙ্গে তোলে। এটা আরও বিশেষ মাত্রা লাভ করে যখন জানা যায় গণফোরামের নেতা ড. কামাল হোসেন বি. চৌধুরীর এই উদ্যোগের সঙ্গে থাকতে পারেন। ড. কামাল হোসেনের 'ঐক্য প্রচেষ্টার' কনভেনশনে ডা. বি. চৌধুরীর যোগদানের সম্ভাবনা এই জল্পনা-কল্পনাকে আরও বিস্তৃত করেছে।

উল্লেখ্য, গণফোরাম নেতা ড. কামাল হোসেন ১১ দলের সঙ্গে থাকলেও বেশ কিছুকাল ধরেই 'ঐক্য প্রচেষ্টা'র নামে একটি 'ঐক্যের মঞ্চ' গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। সেই লক্ষ্যে কখনও নাগরিক সমাজের নামে, কখনও ব্যক্তিগত উদ্যোগে ড. কামাল হোসেন বিভিন্নজনের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। প্রথম দিকে ড. কামালের এই ঐক্য প্রচেষ্টায় ১১ দলের শরিক গণতন্ত্রী পার্টি ও কমিউনিস্ট কেন্দ্র শরিক ছিল। এছাড়াও পরবর্তীতে কাদের সিদ্দিকীর কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ, মুস্তফা আমীনের ফরওয়ার্ড পার্টি যুক্ত হয়। শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রী পার্টি আর সংগঠনগতভাবে ঐক্য প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত থাকেনি। তবে গণতন্ত্রী পার্টির কিছু ব্যক্তি এখনও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। কমিউনিস্ট কেন্দ্র নামক সংগঠনটি কার্যত অস্তিত্বহীন। এর মূল ব্যক্তি অজয় রায় 'ঐক্য প্রচেষ্টা'র সঙ্গে থাকলেও যাদের কিছু সাংগঠনিক ভিত্তি আছে সেই শ্রমিক নেতা ডা. ওয়াজেদ ও কৃষক নেতা মওলানা হোসেন আলী ঐক্য প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হতে রাজি হননি। অপরদিকে ফরওয়ার্ড পার্টি প্রথম দিকে ঐক্য প্রচেষ্টা নিয়ে উৎসাহ দেখালেও এখন তারা বস্তিবাসীদের গৃহায়ন, ভিসামুক্ত বিশ্ব আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত। ফরওয়ার্ড পার্টির নেতা তাদের কার্যালয়ে স্থগিত ঐক্য প্রচেষ্টার দপ্তর বন্ধ করে দিয়েছেন এবং তার ফার্নিচার গণফোরাম অফিসে ফেরত পাঠিয়েছেন। ড. কামাল হোসেন সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছেন, ঐক্য প্রচেষ্টার উদ্যোগে জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে। সেখান থেকে 'জাতীয় ঐক্যমঞ্চ'-এর ঘোষণা ও কর্মসূচি প্রকাশ করা হবে। তবে সেই কনভেনশনে 'ঐক্য প্রচেষ্টা'র সঙ্গে বর্তমানে সংশ্লিষ্ট গণফোরাম, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ, গণতন্ত্রী পার্টি ও কমিউনিস্ট কেন্দ্রের কিছু ব্যক্তি ছাড়া আর কে থাকবে জানা যায়নি। ডা. বি. চৌধুরীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তাকে আমন্ত্রণ জানানো হলে তিনি কনভেনশনে যোগ দেবেন। সংবাদপত্রে কনভেনশনের প্রধান অতিথি হিসেবে বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের নাম এসেছে। তবে গণফোরাম সূত্র জানাচ্ছে, সে ধরনের কোনো কিছুই স্থির হয়নি। ড. কামাল ঐ কনভেনশনের ঘোষণা দিয়েই বিদেশে গেছেন। তিনি ফিরে এলেই ঠিক হবে কারা এতে আসবেন। তবে এ কনভেনশনে ১১ দলের শরিকরা যে সাংগঠনিকভাবে যোগ দিচ্ছে না এটা স্পষ্ট। ১১ দল বলেছে, ওই কনভেনশনের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

ডা. বি. চৌধুরী সম্ভবত একটি রাজনৈতিক দল গঠনের দিকেই এগুচ্ছেন। ঈদের পর সিভিল সোসাইটিকে ঐক্যবদ্ধ করার পদক্ষেপ নেবেন বলে তিনি বললেও সে লক্ষ্যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা যায়নি। বরং ডা. বি. চৌধুরী বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেছেন। বারিধারায় তার কে.সি. মেমোরিয়ালে একটি দপ্তর খোলা হয়েছে।

ডা. বি. চৌধুরীর পুত্র সংসদ সদস্য মাহী চৌধুরী তার বাবার মতই সংবাদ সম্মেলন করে 'দুর্নীতি ও সন্ত্রাসে'র বিরুদ্ধে 'আমরা জিয়া হব' সংগঠনের ব্যানারে আন্দোলন করবেন বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ সংগঠন নিয়ে বিতর্ক ও বিরোধিতা সৃষ্টি হওয়ায় তিনি আপাতত সে ধরনের কিছু করতে যাচ্ছেন না। বরং তিনি বিএনপি মহাসচিবের হস্তক্ষেপ কামনা করছেন এই বিরোধ মেটাতে।

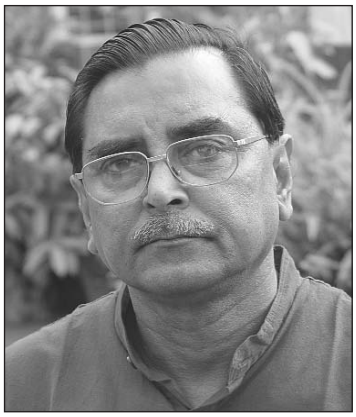

পারবে না। যেমনটা পারেনি কামাল হোসেনের গণফোরাম।

ড. কামাল হোসেনের ঐক্য প্রচেষ্টায় বুদ্ধিজীবী মহলের কেউ কেউ বিএনপি-আওয়ামী লীগের বিক্ষুব্ধ ও বসে পড়া রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা যোগ দিলেও তার প্রস্তাবিত 'জাতীয় ঐক্যমঞ্চ' কোনো শক্তিশালী ধারা হিসাবে গড়ে উঠবে বলে মনে হয় না।

সিভিল সোসাইটি বলতে যারা পরিচিত তাদের প্রায় কারোরই নিজস্ব কোনো মতাদর্শ নেই। তারা সবাই আওয়ামী লীগ বা বিএনপি'র রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী। দলীয় রাজনৈতিক কর্মীর সঙ্গে তাদের খুব বেশি পার্থক্য নেই

বি. চৌধুরী বা ড. কামাল হোসেনের যে রাজনৈতিক পরিচিতি তাতে তাদের তৃতীয় শক্তি বা নতুন ধারার কোনো রাজনৈতিক শক্তির নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা আছে কিনা সেটা নিয়ে বড় প্রশ্ন রয়েছে। বি. চৌধুরী বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব হলেও সাংগঠনিকভাবে দক্ষ মানুষ হিসেবে তার পরিচিতি নেই। যদিও ডাক্তার হিসেবে তার ব্যাপক সুনাম রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি করলেও তাকে জনসম্পৃক্ত রাজনীতিবিদ বলা যায় না। বিএনপির রাজনীতির বাইরে তাকে আলাদা 'মহৎ' কোনো আদর্শের ধারক-বাহক হিসেবে ভাবারও সুযোগ নেই। কারণ সারা জীবন ধরে তিনি জিয়ার 'উনিশ দফা' এবং 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ'ই জাতিকে বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি বিএনপি করাকালীন, বিরোধী দলের বিএনপি বা ক্ষমতার বিএনপির কোনো অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে কথা বলেননি। '৯৬-এর নির্বাচনের আগে বিটিভির 'সবিনয় জানতে চাই' অনুষ্ঠানে বিএনপির প্রতিনিধিত্ব করতে এসে টেলিভিশনের শায়ত্তশাসন জাতীয় নানা ইস্যুতে অত্যন্ত অযৌক্তিক কথা বলে নিজের ইমেজ নষ্ট করেছিলেন। প্রশাসক হিসেবেও বি. চৌধুরীর যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। '৯১ সালের খালেদা জিয়া সরকারের তিনি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। স্কুল ছাত্রদের দাবির মুখে 'প্রশ্নব্যাংক' পদ্ধতি চালু করেছিলেন। এটা ছিল বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে নেয়া সবচেয়ে ক্ষতিকর সিদ্ধান্তগুলোর একটি। সেই বি. চৌধুরী জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের দায়িত্ব নিয়ে সফল হবেন এমনটা আশা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

তৃতীয় শক্তির আরেক নেতা ড. কামাল হোসেন। আইনবিদ হিসেবে তিনি পৃথিবীখ্যাত। কিন্তু রাজনীতিবিদ হিসেবে একেবারেই দুর্বল। রাজনীতি এবং দেশের মানুষের প্রতি তার কতটা কমিটমেন্ট আছে সেটা নিয়েও প্রশ্ন আছে। গত আওয়ামী সরকারের আমলে বস্তিবাসীদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্ব নিজেই নিয়েছিলেন। বস্তিবাসীদের এনে জড়ো করেছিলেন হাইকোর্টের সামনে। আগের দিন যে বস্তিবাসীদের তিনি নিয়ে এসেছিলেন হাইকোর্টের সামনে, পরের দিন তাদের অসহায়ভাবে রেখে চলে গিয়েছিলেন আফগানিস্তানে। হয়তো এটা তার পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি ছিল। কিন্তু সেটা যদি থেকেই থাকে তাহলে বস্তিবাসীদের নিয়ে এমন 'স্ট্যান্টবাজি'র প্রয়োজন কী ছিল?

আওয়ামী লীগ থেকে বিতাড়িত হয়ে এসে গঠন করলেন গণফোরাম। সঙ্গে নিলেন আরেক বিতাড়িত আওয়ামী লীগ নেতা মোস্তফা মহসীন মন্টুকে। একদা আওয়ামী লীগার বর্তমানে জিয়ার সৈনিক মন্টুর রাজনৈতিক পরিচিতি কী, সন্ত্রাসের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক, সেটা কম-বেশি অনেকেরই জানা। সেই মোস্তফা মহসীন মন্টুর উপস্থিতিতে এলিফেন্ট রোড এলাকার শ' দুয়েক সন্ত্রাসীর সামনে কামাল হোসেন বক্তৃতা করতেন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। সুতরাং কামাল হোসেনের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বা বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন করাটা অন্যায় কিছু নয়।

সুতরাং কামাল হোসেন বা বি. চৌধুরী মহামানব হিসেবে আবির্ভূত হয়ে দেশের রাজনীতিতে মৌলিক কোনো পরিবর্তন সাধন করবেন- এমনটা ভাবার সম্ভবত অবকাশ নেই। তবে বি. চৌধুরী আলাদা রাজনৈতিক দল গঠন করলে সাময়িকভাবে বিএনপির কিছুটা বিপদে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিএনপির সুবিধাবঞ্চিত হতাশ কিছু নেতার তার সঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু গঠনমূলক কোনো সুনির্দিষ্ট আদর্শ না থাকায় সেই রাজনৈতিক দলটি লাইম লাইটে আসতে

বিএনপি-জামায়াত জোটের অধীনে দেশের শাসনব্যবস্থা এক চরম অচলাবস্থায় উপনীত হয়েছে। দেশে কোনো সরকার আছে কিনা এটা বোঝা যায় না। সংসদে জোট সরকারের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরও জাতীয় ও জনজীবনের সমস্যাবলী সমাধানের ব্যাপারে জোট সরকার একেবারেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। সরকার পরিচালনায় প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের পাশাপাশি আরো অনেক শক্তির কথা আলোচনায় আসছে। সরকারের ভেতরে চেইন অব কমান্ডের অভাব প্রকটভাবে অনুভূত হচ্ছে। পশ্চিমা দূতাবাস ও বিদেশী দাতা সংস্থাসমূহ গত দু' বছরেও জোট সরকার কর্তৃক 'স্বাধীন দুর্নীতি তদন্ত কমিশন' গঠন না করা, মানবাধিকার কমিশন গঠন না করায় বিশেষভাবে বিরক্ত। ইউএনডিপি'র বাংলাদেশস্থ প্রতিনিধি ডেভিড শিসনার সরাসরিই মন্তব্য করেছেন, এই সরকারের আমলে 'মানবাধিকার কমিশন' গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। দুর্নীতি রোধের ব্যাপারেও পশ্চিমা দাতাসংস্থাসমূহও তাদের হতাশা ব্যক্ত করেছে। আইন পরিস্থিতি এমন জায়গায় নেমেছে যে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য দেয়ার কথা বলেছেন। অর্থাৎ মার্কিন রাষ্ট্রদূত এখন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিষয়টিও দেখবেন।

দেশের ব্যবসায়ী-শিল্পপতিরাও জোট সরকারের আচরণে বিরক্ত এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ সরকারের পতন ঘটানোর জন্য ঐ 'তৃতীয় শক্তি'র পেছনে বিনিয়োগ করার

কথাও ভাবছেন বলে জানা যায়। সম্প্রতি দেশের শীর্ষ শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এফবিসিসিআই-এর সভাপতি দেশের শাসন পরিচালনা সম্পর্কে কড়া ভাষায় কথা বলেছেন।

দেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরাও জোট সরকারের ওপর ক্ষুব্ধ। বিএনপি-জামায়াতের সংসদ সদস্যরা মিলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের জন্য আইন প্রণয়নের কথা বলছেন। অন্যদিকে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা শহরে সাংবাদিকরা জোট অনুসারীদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে।

সব মিলিয়ে দেশে যে এক ধরনের অস্বস্তিকর ও অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তাতে লোকের মুখেই এখন সরকার পরিবর্তনের কথা উঠেছে। বাম এগারো দল সরকারের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে বলে দিয়েছে যে এই সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোনো অধিকার নেই। এই সরকারকে 'না' বলুন। এবং সেই লক্ষ্যে এগারো দল ঈদের আগেই ১৩ ডিসেম্বর হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করে এবং ঈদের পরপরই পয়লা ডিসেম্বর বিজয় মাসের শুরুতে মন্ত্রিসভা থেকে যুদ্ধাপরাধীদের বহিষ্কারসহ বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের অপসারণের দাবিতে 'কালো পতাকা' মিছিল দিয়ে আন্দোলনের কর্মসূচি শুরু করে। এগারো দলের নেতৃবৃন্দ তিন দিনের ঝটিকা সফরে সারা দেশে হরতাল সংগঠিত করার প্রস্তুতি নেয়। ১৩ ডিসেম্বরে এগারো দলের হরতালটি ছিল একটি সফল ও সংগঠিত হরতাল। এই সরকারের প্রতি জনগণ কতখানি বিক্ষুব্ধ সেটা ঐ হরতালের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মত। ঐ হরতালে এগারো দলের মিছিলে পুলিশের আক্রমণ বিশেষ করে এগারো দলের সমন্বয়ক ও ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেননের আহত হওয়ার ঘটনায় সারা দেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

রাষ্ট্র পরিচালনায় জোট সরকার ক্রমশ ব্যর্থতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জোট সরকারের ব্যর্থতার ফসল কে ঘরে তুলবে, চলছে সেই প্রতিযোগিতা। এটাই এখন আলোচনার বিষয়। আসলে 'তৃতীয় শক্তি' এখনও পর্যন্ত কথার ফানুস। বাংলাদেশের মানুষ একবার আওয়ামী লীগ দ্বারা একবার বিএনপি দ্বারা শাসিত হচ্ছেন না, প্রতারিত হচ্ছেন। মানুষ এখন একটা প্রকৃত পরিবর্তন চান। দেশের রাজনীতি-রাজনৈতিক সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন চান। ব্যবস্থারও পরিবর্তন চান। আর 'তৃতীয় শক্তি' সম্পর্কে যেসব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কথা শোনা যাচ্ছে তারা ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনায় সৃষ্টি হলেও তারা বাংলাদেশের আন্দোলনে সংগ্রামে বিশেষ কোনো ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারেননি এ যাবৎকালে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য যে সাহস, দূরদৃষ্টি প্রয়োজন তা তাদের নেই। ক্ষমতার সাজানো মসনদেই তারা বিচরণ করেছে এ যাবৎকাল। সুতরাং ক্ষমতাসীন অথবা অন্যরা যখন চ্যালেঞ্জ করবে খুব সহজেই তাদের পিছু হটে যাওয়ার সম্ভাবনা। তবে এসব ব্যক্তিদের পিছনে বিদেশী দূতাবাস অথবা উত্তরপাড়ার পরিকল্পনার কোনো সম্পর্ক থাকে তবে ভিন্ন কথা। সে ক্ষেত্রেও দেশে আন্দোলন-সংগ্রামের এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে যাতে এই কথিত 'তৃতীয় শক্তি' তার সুযোগে রাজনীতিতে সামনে আসতে পারে। ক্ষমতায় যেতে পারে। যে 'তৃতীয় শক্তি'র গল্প-কথা প্রচার করা হচ্ছে তা কি পারবে সেই ধরনের একটি অবস্থা তৈরি করতে?

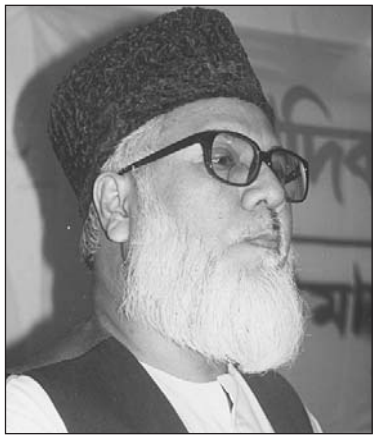

রাজনীতিতে তারা যদি একত্রিত হয়ে কিছু একটা করেন, সেটা হয়তো আওয়ামী লীগের সহযোগী শক্তি হতে পারে, মূল শক্তি নয়। মূল শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার জন্য যে যোগ্যতাসম্পন্ন নেতা প্রয়োজন তেমন কোনো নেতা আমাদের চোখের সামনে নেই। বি. চৌধুরী বা কামাল হোসেন তো নয়ই

আমরা অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করেছি। কিন্তু পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হয়নি। আগে প্রেসিডেন্ট ছিলেন সর্বেসর্বা, এখন প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশের রাজনীতিতে খালেদা, হাসিনা- যার যার অবস্থানে ঈশ্বরতুল্য। তাদের বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন- এমন কেউ দলে নেই। দলে শেখ হাসিনাকে কখনো কখনো সামান্য বিরোধিতার মুখে পড়তে হলেও, খালেদা জিয়াকে কখনোই পড়তে হয় না। বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক বাস্তবতা তাতে খালেদার বিএনপি আর হাসিনার আওয়ামী লীগের বাইরে তৃতীয় কোনো গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তির ক্ষমতায় আসার আপাতত কোনো সম্ভাবনা নেই।

বি. চৌধুরী বা কামাল হোসেন দায়দায়িত্বহীন ব্যক্তিত্ব। একজন ডাক্তার হিসেবে, একজন আইনবিদ হিসেবে বিখ্যাত। রাজনীতিতে তারা যদি একত্রিত হয়ে কিছু একটা করেন, সেটা হয়তো আওয়ামী লীগের সহযোগী শক্তি হতে পারে, মূল শক্তি নয়। মূল শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার জন্য যে যোগ্যতাসম্পন্ন নেতা প্রয়োজন তেমন কোনো নেতা আমাদের চোখের সামনে নেই। বি. চৌধুরী বা কামাল হোসেন তো নয়ই। তাহলে জাতির ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাবে কে? কোথায় সেই মহামানব? মহামানব তো আকাশ থেকে পড়বে না, মাটি খুঁড়েও বের হবে না। আসতে হবে এই সমাজ থেকে, এই দেশ থেকেই।

জাতির বেশিরভাগ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা আছে এমন একজন মানুষের নাম বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমেদ। শাহাবুদ্দীনের মতো একজন মানুষ যদি জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের দায়িত্ব নিয়ে রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হতেন তাহলে কিছুটা আশাবাদী হওয়ার অবকাশ থাকতো। কিন্তু এটাও অনেকটা ইউটোপিয়া জগতের চিন্তাভাবনা। বাস্তবে তৃতীয় শক্তি বা নতুন ধারা নিয়ে শুধু আলোচনাই সম্ভব। খুব দ্রুত হাসিনা-খালেদা বা আওয়ামী লীগ-বিএনপির হাত থেকে বাংলাদেশের মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।